অন্ধ যে দেশে সবাইলেই

এইচ জি ওয়েলস

অন্ধ যে দেশে সকলেই

(The Country of the Blind)

রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় আছে অন্ধদের দেশ। আশ্চর্য সেই দেশে অন্ধ প্রত্যেকেই। চক্ষুষ্মানের ঠাঁই নেই সেখানে। লোমহর্ষক এই কাহিনি শোনা গিয়েছিল একজনেরই মখে, দৈবাৎ পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে পৌঁছেছিল সেই দেশে, চক্ষুরত্ন সম্বল করে পালিয়ে এসেছিল কোনওমতে।

অনেক... অনেক দূরের পথ সেই পার্বত্য উপত্যকা। শিমবোরাজো থেকে সাড়ে তিনশো মাইলেরও বেশি, কোটোপাক্সির তুষার-ছাওয়া অঞ্চল থেকে শখানেক মাইল তো বটেই। ইকুয়েডর্স অ্যান্ডিজের ধু ধু ঊষর অঞ্চলে রয়েছে সেই অবিশ্বাস্য দেশ–যে দেশে অন্ধ সকলেই।

বহু বছর আগে কিন্তু পাহাড়-পর্বত টপকে, গিরিবর্ত্মের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যেত সেই উপত্যকায়। অত্যাচারী স্পেনীয় শাসকের খপ্পর থেকে পালিয়ে কয়েকটি পেরুভিয়ান দোআঁশলা পরিবার পৌঁছেছিল সেখানে।

তারপরেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হল মিনডোবাম্বায়, সতেরো দিন নিশীথ রজনিতে আবৃত রইল কুইটো, জল ফুটতে লাগল আগুয়াচিতে, গুয়ায়াকুইল দিয়ে ভেসে গেল অগুনতি মরা মাছ। প্রশান্ত মহাসাগরের পাহাড়ি ঢাল বরাবর ধস, অকস্মাৎ জলপ্লাবন, আরাউকা শিখরের ধসন বজ্রধনির মধ্যে দিয়ে চিরতরে রুদ্ধ করে দিলে

অন্ধদের দেশে প্রবেশের যাবতীয় পথ। দুনিয়া যখন এইভাবে প্রকম্পিত, তার আগেই একজন... শুধু একজন ছিটকে এসেছিল বহির্জগতে... রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় থেকে গিয়েছিল তার স্ত্রী আর ছেলে। বাইরের দুনিয়ায় নতুন করে সে জীবন শুরু করে। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গ ঘটে অচিরেই, অন্ধত্ব ছিনিয়ে নেয় চোখের দৃষ্টি, খনি অঞ্চলে অসীম শাস্তিভোগের পর একদিন রওনা হয় পরলোকের পথে। কিন্তু যে কাহিনি সে শুনিয়ে গিয়েছিল, তা আজও কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে অ্যান্ডিজের করডিলারাসে।

দক্ষিণ আমেরিকায় উটের মতো একরকম জন্তু দেখা যায়। কিন্তু উটের চাইতে ছোট এবং পিঠে কুঁজ নেই। নাম, লাম্যা। শৈশবে এই লামার পিঠে মালপত্র সমেত তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সুদুরের সেই উপত্যকায়। নয়নাভিরাম সেই উপত্যকায় মানুষ যা পেলে সুখী হয়, শান্তি পায়, তার সবই আছে। আছে গাছে গাছে ফল, সুপেয় জল, কৃষিক্ষেত্র, মনোরম আবহাওয়া, উর্বর বাদামি মৃত্তিকা, তুষার পর্বতের গায়ে নিবিড় অরণ্য। তিনদিকে ধূসর সবুজ পাহাড় উঠে গেছে যেন আকাশ অবধি-চিরতুষারে ঢাকা তাদের কিরীট। হিমবাহ নদী কিন্তু উপত্যকায় না এসে বয়ে যায় পাহাড়ের অন্যদিকের ঢাল বরাবর। মাঝে মাঝে বরফের চাঙড় খসে পড়ে উপত্যকায়। বৃষ্টি হয় না সেখানে, তুষারপাতও ঘটে না। স্থির পাহাড়ি ঝরনার জলে বারো মাস সবুজ থাকে চাষের জমি, প্রান্তর, তৃণভূমি। মানুষজনের কোনও চাহিদা অপূরণ থাকে না সেখানে, সুখী সেখানকার প্রতিটি পশুপক্ষী।

কিন্তু অতৃপ্তি ছিল কেবল একটি ব্যাপারে। দেবতার উপাসনা মন্দির ছিল না একটিও। তাই যখন অব্যাখ্যাত সংক্রমণে দৃষ্টিশক্তি হারাতে লাগল একে একে অনেকেই, এমনকী দৃষ্টিহীন হয়ে ভূমিষ্ঠ হল বহু নবজাতক, তখন একজন–শুধু একজনই–মন্দির প্রতিষ্ঠার

সংকল্প নিয়ে ছিটকে এসেছিল অভিশপ্ত অথচ অপরূপ সেই উপত্যকা থেকে। সে সময়ে সংক্রমণ কী বস্তু তা কেউ বুঝত না। দৃষ্টিহীনতার কারণ নিশ্চয় দেবতার অভিশাপ বদ্ধমূল এই ধারণা নিয়ে সে চলে এসেছিল একখণ্ড রুপোর বাট পোশাকের ভেতরে লুকিয়ে। কোথায় পেয়েছিল এই রজতখণ্ড, তা কিন্তু অনভিজ্ঞ মিথুকের মতো বর্ণনা করতে গিয়ে কৌতূহলই জাগ্রত করেছিল প্রত্যেকের অন্তরে। মূল্যবান এই ধাতু নিশ্চয় অঢেল পাওয়া যায় সেখানে কিন্তু মুদ্রার অথবা অলংকারের প্রয়োজন নেই বলে হেলায় পড়ে থাকে। ক্ষীণদৃষ্টি, রৌদ্রদগ্ধ, শীর্ণকায় যুবকটি সাগ্রহে পুরুতদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, দেবতার অধিষ্ঠান যেন ঘটে অভিশপ্ত উপত্যকায়। নইলে যে অন্ধ হয়ে যাবে সকলেই।

কিংবদন্তির শুরু সেই থেকেই। বহু দূরে... সুদূর উপত্যকায় বসবাস করে অন্ধ মানুষের একটা প্রজাতি।

আজও শোনা যায় সেই কিংবদন্তি।

পর্বতবেষ্টিত বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, মুষ্টিমেয় মানুষগুলির মধ্যে কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বিচিত্র ব্যাধি। প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রবীণরা, ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে এসেছিল নবীনরা, দৃষ্টিহীন হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল শিশুরা।

জীবনের ধারা কিন্তু বয়ে গিয়েছিল নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। যেখানে কাঁটাঝোপ নেই, কীটপতঙ্গের উপদ্রব নেই, হিংস্র শ্বাপদের হামলা নেই–যেখানে শান্ত-প্রকৃতি লাম্যা বিচরণ করে দলে দলে, সমীরণ বয় মৃদুমন্দ বেগে, ঝরনা ঝরে পড়ে অবিরাম, অন্ধ হয়েও সেখানে কারও জীবনে যতি পড়েনি। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে হতে লোপ পেয়েছিল এত

ধীরে যে, ক্ষতিটাকে ক্ষতি বলে কেউ মনেও করেনি। অল্প দৃষ্টি নিয়েও সর্বত্র বিচরণ করে নখদর্পণে রেখেছিল পুরো উপত্যকাকে। তারপর যখন একেবারেই লোপ পেল দৃষ্টিশক্তি, বহাল তবিয়তে টিকে গেল পুরো প্রজাতিটা। পাথরের উনুনে আগুনও জ্বালাত চোখ না থাকা সত্ত্বেও। শিক্ষাদীক্ষা ছিল না বললেই চলে। অক্ষরপরিচয় ঘটেনি কোনওদিনই। স্পেনীয় সভ্যতার ছিটেফোঁটা, সুপ্রাচীন পেরু সংস্কৃতি আর লুপ্ত দর্শন–এই ছিল তাদের একমাত্র কৃষ্টি। অতিবাহিত হয়েছিল প্রজন্মের পর প্রজন্ম। বিস্মৃত হয়েছিল অনেক কিছুই, উদ্ভাবনও করেছিল অনেক কিছু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বহির্জগতের বর্ণোজ্জ্বল সংস্কৃতি। কিন্তু নিটোল ছিল স্বাস্থ্য, অফুরন্ত ছিল দৈহিক শক্তি হারিয়েছিল কেবল চক্ষু প্রত্যঙ্গ। পুরানো দিনের কাহিনি মুছে গিয়েছিল এক প্রজন্মে। এইভাবেই কেটে গিয়েছিল পরপর পনেরোটি প্রজন্ম–রজতখণ্ড বুকে নিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ অন্বেষণে উপত্যকার বাইরে গিয়েছিল যে যুবকটি, সে কিন্তু আর ফিরে আসেনি। দীর্ঘ পনেরোটি প্রজন্মের পর তার কথাও কারও স্মৃতিপটে বিরাজমান থাকার কথা নয়। তারপর আশ্চর্য সেই উপত্যকায় বাইরের দুনিয়া থেকে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল যে মানুষটি, নাম তার নানেজ। এ কাহিনি শুনেছি তারই মুখে।

কুইটোর কাছে একটা গ্রামনিবাসী পর্বতারোহী সে। বই-পড়া বিদ্যে ছাড়াও সমুদ্রপথে দেখেছে এই পৃথিবীটাকে। ইংরেজদের একটি পর্বত অভিযাত্রীদলে তার ঠাই হয়েছিল তিনজন সুইস পথপ্রদর্শক অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ইকুয়েডরে এসেছিল তারা পর্বতারোহণের অভিপ্রায়ে। বিশেষ একটি উচ্চশিখর জয় করতে গিয়ে একদিন নিখোঁজ হয় নানেজ। তুষার-ছাওয়া শিখরের কিছু নিচেই তাঁবু পেতে অনেক হাঁকডাক এবং বাঁশি বাজিয়েও আর তার সাড়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার বিবরণ প্রায় বারোবার প্রকাশিত হয়েছে। পয়েন্টারের বিবরণটাই সবচেয়ে নাটকীয় এবং বিশদ।

বিনিদ্র রজনি যাপনের পর সকালবেলা তারা দেখেছিল পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার বহু চিহ্ন। নিশ্চয় আর্ত-চিৎকার করেছিল নানেজ গড়িয়ে পড়ার সময়। কিন্তু কেউ তা শোনেনি –এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। অথবা হয়তো গলা ফাটিয়ে চেঁচাবার সুযোগও পায়নি। পা পিছলে পড়েছে পাহাড়ের পূর্বদিকে–যেদিকটার কোনও খবরই রাখে না অভিযাত্রীরা। তুষারের বুক কেটে লাঙল চষার মতো পতনচিহ্ন অতিশয় সুস্পষ্ট, বুক-কাঁপানো খাড়াই ঢাল বেয়ে সটান গড়িয়ে গেছে বলেই চেঁচাবার ফুরসতও পায়নি। তারপর আর কিছুই চোখে পড়েনি। অনেক, অনেক নিচে দেখা গেছে কেবল সারি সারি মহীরুহ। অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো, একটা বদ্ধ উপত্যকা ঘিরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে এক নিবিড় অরণ্য, অন্ধদের হারিয়ে-যাওয়া দেশ। অভিযাত্রীরা কিন্তু জানত না, এই সেই কিংবদন্তির দেশ, অন্ধদের উপত্যকা। এরকম উপত্যকা আরও রয়েছে দুর্গম এই পাহাড়ি অঞ্চলে। দুর্ঘটনাটা কিন্তু তাদের নার্ভাস করে দেয়। বিকেলের দিকে অভিযান মুলতুবি রেখে নেমে আসে পাহাড় থেকে। তারপরেই যুদ্ধে যেতে হয় পয়েন্টারকে। আজও পার্সকোটোপেটল শিখর কেউ জয় করতে পারেননি। আজও শিখরের ঠিক নিচেই পয়েন্টারের ঘাঁটি তুষারাবৃত হয়ে পড়ে আছে।

পাহাড় থেকে পড়ে-যাওয়া মানুষটা কিন্তু মরেনি-প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল স্রেফ আয়ু ছিল বলে।

হাজার ফুট গড়িয়ে এসেছিল চক্ষের নিমেষে। তার পরেও হাজারখানেক ফুট পিছলে গিয়েছিল পতনের বেগে আরও খাড়াই ঢাল বেয়ে। তুষার সেখানে আরও পুরু। পাকসাট খেতে খেতে আচমকা এইভাবে গড়িয়ে পড়ার ফলে মাথা ঘুরে গিয়েছিল, চৈতন্য লোপ

পেয়েছিল, কিন্তু একটা হাড়ও ভাঙেনি নরম তুষার গদির ওপর পিছলে যাওয়ার দরুন–খাড়াই ঢাল আর ততটা খাড়াই থাকেনি–আস্তে আস্তে মন্দীভূত হয়েছে পতনের বেগ, নরম তুষারস্তূপে আলতোভাবে আছড়ে পড়ায় বেঁচে যায় প্রাণটা। জ্ঞান ফিরে আসার পর মনে হয়েছিল, বুঝি বা অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছে কোমল শয্যায়। কিন্তু অচিরেই পর্বতারোহীর উপস্থিতবুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করেছিল পরিস্থিতির গুরুত্ব। তুষার-গদির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিল আকাশের অগুনতি তারার পানে চেয়ে। হাড়গোড় একটাও ভাঙেনি। শুধু যা কোটের সব কটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে। পকেট থেকে ছুরিটাও পড়ে গেছে। থুতনির সঙ্গে বাঁধা টুপিটাও নিপাত্তা। একটু একটু করে মনে পড়েছিল, পাথর খুঁজছিল আস্তানা বানাবে বলে। পা পিছলেছে তখনই। বরফ-কুঠারও ছিটকে গেছে হাত থেকে।

তখন চাঁদ উঠেছে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের ঢাল দেখে বুঝেছিল, আচমকা পা পিছলে গিয়ে সটান নেমে আসার ফলেই মাথা ঘুরে গিয়েছিল, চেঁচাতেও পারেনি।

পায়ের তলায় কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ঝোপ। তুষারপ থেকে পা টিপে টিপে নেমে গিয়েছিল সেখানে। ফ্লাস্কের জল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল একটা গোলাকার স্থলিত শিলার পাশে।

ঘুম ভেঙেছিল পাখির গানে। ঐকতান শোনা যাচ্ছে মাথার ওপর।

খাড়াই পাহাড়ের পর পাহাড় উঠে গেছে যেন আকাশ পর্যন্ত। পূর্ব আর পশ্চিমে প্রাচীরের মতো পাহাড়। রৌদ্রালোকে প্রদীপ্ত।

পায়ের তলায় ঢাল বেয়ে কিন্তু নামা যায়। চিমনির মতো একটা ফাঁক বরাবর ঝরনার জল গড়িয়ে যাচ্ছে। সন্তর্পণে সেইখান দিয়ে কিছুটা নেমে আসার পর বহু দূরে উপত্যকার মধ্যে দেখেছিল কয়েকটা প্রস্তর-কুটির।

জঙ্গল পড়েছিল নামবার পথে। পেরিয়ে এসেছিল হুশিয়ার চরণে।

দুপুর নাগাদ পৌঁছেছিল গিরিবর্ত্মের তলদেশে। পাহাড়ি ঝরনার জল পান করে, একটু জিরিয়ে নিয়ে রওনা হয়েছিল প্রস্তর-কুটিরগুলোর দিকে।

পুরো উপত্যকাটাই মনে হয়েছিল কেমন যেন অদ্ভুত। বাড়িগুলোর চেহারাও সৃষ্টিছাড়া। বিভিন্ন রঙের পাথর দিয়ে তৈরি। কখনও ধূসর পাথর, কখনও উজ্জ্বল। অত্যন্ত বেমানানভাবে অজস্র রঙের পাথর দিয়ে প্রস্তর-কুটির নির্মাণ করেছে যারা, তারা যেন চোখের ব্যবহার করতেও জানে না। অন্ধ নাকি? অন্ধ শব্দটা সেই প্রথম তার মাথায় এসেছিল শুধু এই বর্ণবৈষম্য দেখে।

অথচ বৈষম্য নেই আর কোথাও। নিখুঁত পারিপাট্য বিরাজমান সর্বত্র। বহু উঁচুতে ঘুরে বেড়াচ্ছে লাম্যার দল। পাহাড়ি ঝরনার জল সঞ্চিত হচ্ছে একটা বিশাল উঁচু প্রাচীরের মতো পরিখায়। জ্যামিতিক ছকে সাজানো বিস্তর কৃষিক্ষেত্রে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই পরিখা থেকে। নিয়মিত ব্যবধানে বহু পাথর বাঁধাই পথ বেরিয়েছে মূল পরিখা থেকে। একটা চওড়া নালা নেমে এসেছে, নালার দুপাশে বুকসমান উঁচু পাঁচিল। কুটিরগুলোও নিয়মিত ব্যবধানে নির্মিত পথের দুপাশে, পথটিও আশ্চর্যভাবে পরিষ্কার। পাহাড়ি গ্রামের কুটির ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, এখানে তা নয়।

আরও একটু নেমে এসেছিল নানেজ। উপত্যকা ঘিরে-থাকা পাঁচিল আর পরিখার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল, নালার বাড়তি জল জলপ্রপাতের আকারে ঝরে পড়ছে উপত্যকার এক প্রান্তে একটা গভীর খাদের মধ্যে। পুরো উপত্যকার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে নালাটা, প্রতিটি জমিতে জলসিঞ্চনের অপূর্ব ব্যবস্থা দেখে অবাক না হয়ে পারেনি। দূরে স্তূপীকৃত ঘাসের ওপর যেন দিবানিদ্রা দিচ্ছে কয়েকজন নারী এবং পুরুষ। প্রান্তরের অপরদিকে কুটিরগুলোর সামনে খেলা করছে কয়েকটি শিশু। কাছেই, উঁচু পাঁচিল বরাবর পথ বেয়ে কুটির সারির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তিনজন পুরুষ। জলপাত্র বয়ে নিয়ে চলেছে জোয়ালের ওপর। খুব কাছে রয়েছে বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ। পায়ের বুটও লাম্যার চামড়ায় তৈরি। কান আর কাঁধ-ঢাকা টুপি রয়েছে মাথায়। চলেছে একজনের পেছনে আর-একজন। যাচ্ছে আর হাই তুলছে, যেন সারারাত কেউ ঘুমায়নি। হাবভাব দেখে সম্ভ্রমবোধ জাগে, সমৃদ্ধির ছাপ যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত। মনে সাহস পায় নানেজ। আরও একটু এগিয়ে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়েছিল তারস্বরে। প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল নিবিড় প্রশান্তির নিকেতন সেই উপত্যকা।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল লোক তিনটে। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার অনেক চেষ্টা করেছিল নানেজ। কিন্তু তিনজনের কেউই যেন তাকে দেখতে পায়নি। এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়েছে অন্ধের মতো। তারপর ডানদিকে মুখ ঘুরিয়ে সাড়া দিয়েছিল জোর গলায়।

অন্ধ নাকি? ফের মনে মনে বলেছিল নানেজ।

বেশ কিছুক্ষণ চেঁচা- মেচি করার পর রেগে মেগে পাথর থেকে নেমে এসেছিল নানেজ। ছোট্ট স্রোতস্বিনীটা পেরিয়ে এসেছিল সাঁকোর ওপর দিয়ে। পাঁচিলের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকেছিল ভেতরে। গটগট করে এগিয়ে গিয়েছিল তোক তিনটের দিকে। তিনজনেই যে অন্ধ, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই ছিল না মনে। অনেকদিন ধরেই শুনে আসছিল, অন্ধদের দেশ আছে দুর্গম পাহাড়ের কোলে। তখন মনে হয়েছিল অলীক উপকথা। বিশ্বাস করতে মন চায়নি। এখন তো স্বচক্ষে দেখছে সেই দেশ। অন্ধদের দেশে মস্ত অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পেয়ে বসেছিল নানেজকে। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল দুই চক্ষুর অধিকারী মানুষটা চক্ষুহীন তিনজনের দিকে।

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজন তার দিকে কান পেতে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কানই যেন তাদের চোখ। কান দিয়ে শুনে বুঝেছিল ওই পায়ের আওয়াজ তাদের একেবারেই অচেনা। তাই ভয় পেয়েছিল। পরস্পরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল তিনজনে। কাছ থেকে নানেজ দেখছিল। চোখের পাতা তাদের বন্ধ, অক্ষিকোটরে যেন চোখ ঢুকে রয়েছে, চক্ষুগোলক যেন হারিয়ে গেছে কোটরের মধ্যে। আতঙ্ক পরিস্ফুট তিনজনেরই মুখের পরতে পরতে।

ফিসফিস করে দুর্বোধ্য স্পেনীয় ভাষায় বলেছিল একজন, প্রেত অথবা মানুষ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে—

নানেজের প্রতি পদক্ষেপে কিন্তু তখন যৌবনের সুগভীর আত্মপ্রত্যয়। মাথার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে চারণগীত–একচক্ষুও যেন রাজা অন্ধদের সেই দেশে। দৃষ্টিহীনদের আশ্চর্য দেশের অত্যাশ্চর্য সমস্ত গল্পই হুটোপুটি জুড়েছে মাথার মধ্যে।

একচক্ষুও যেন রাজা অন্ধদের সেই দেশে।

রাজার মতোই তাই বীরোচিত পদক্ষেপে, বুক উঁচিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায় অগ্রসর হয়েছিল নানেজ। সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিল তিন চক্ষুহীনকে নিজের চক্ষুরত্নের পূর্ণ ব্যবহার করে।

ফিসফিস করে তিনজনের একজন বলে উঠেছিল, পেড্রো, কোত্থেকে এল বল তো?

পাহাড়ের ওপার থেকে।

পাহাড়ের ওপার থেকে বলেছিল নানেজ। এমন একটা দেশ থেকে, যে দেশের সবাই দেখতে পায়। বাগোটার কাছে আছে সেই দেশ, আছে হাজার হাজার মানুষ, বিরাট শহর, দৃষ্টি দিয়েও তার শেষ দেখা যায় না।

দৃষ্টি? বিড়বিড় করে উঠেছিল পেড্রো, দেখা?

নিম্নস্বরে বলেছিল দ্বিতীয় অন্ধ, পাহাড়ের বাইরে থেকে এসেছে।

নানেজ তখন খুঁটিয়ে দেখছিল তিনজনের পোশাক। অদ্ভুত ফ্যাশনের পোশাক। তিনজনের তিনরকম। সেলাই আর কাটছাঁটও তিনরকম।

চমকে উঠেছিল পরক্ষণেই। সামনে বিস্তৃত দুহাতের দশ আঙুল বাড়িয়ে একযোগে তিন অন্ধ এগিয়ে আসছে তাকে ধরতে। ঝটিতি নাগালের বাইরে সরে এসেছিল নানেজ, কিন্তু পালাতে পারেনি। পায়ের শব্দ শুনে ঠিক সেইদিকেই ছুটে গিয়ে নানেজকে কষে চেপে

ধরেছিল তিনজনে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখে নিয়ে সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিল একজন, হুশিয়ার!

নানেজের চোখে আঙুল পড়তেই আঁতকে উঠেছিল অন্ধ মানুষটা। চোখের পাতা পড়ছে, চোখ নড়ছে! অদ্ভুত ব্যাপার তো! আবার হাত বুলিয়ে দেখেছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। পেড্রো নামধারী অন্ধ বলেছিল, কোরিয়া, এ তো আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া জীব! মাথার চুল লাম্যার মতো কড়া!

শুধু চুল নয়, গালও পাথরের মতো কর্কশ, নানেজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল কোরিয়া, হাতও ভিজে ভিজে। পাহাড় থেকে এসেছে তো, পাহাড়ের মতোই নোংরা। পরে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবেখন।

কথা চলছে, কিন্তু নানেজকে কেউ ছাড়ছে না, শক্ত মুঠিতে এমনভাবে ধরে রেখেছে যে পালানোর ক্ষমতাও নেই। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বুঝেছিল, চোখ না থাকতে পারে, এদের গায়ে জোর আছে বিলক্ষণ।

পেড্রো বলেছিল, ওহে, তুমি তো কথাও বল, মানুষ নিশ্চয়?

মানুষ তো বটেই, তোমাদেরই মতো মানুষ। তফাত শুধু এক জায়গায়–তোমাদের চোখ। নেই–আমার চোখ আছে–দেখবার ক্ষমতা আছে।

দেখবার ক্ষমতা! পেড্রো বিমূঢ়।

হ্যাঁ, তোমরা যে দেশের মানুষ, আমি এসেছি সে দেশের বাইরে থেকে। সে দেশ হিমবাহ পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে, অনেক দূরে, সূর্যের কাছাকাছি। সেখান থেকে সমুদ্র মোটে বারো দিনের পথ।

বৃথাই বকে গিয়েছিল নানেজ। দৃষ্টিশক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে কিসসু বোঝাতে পারেনি অন্ধদের। উলটে নানেজকে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রবীণদের কাছে, তখন কবলমুক্ত হতে গিয়েছিল গায়ের জোরে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনও মনে হয়? সে কি অন্ধ? রীতিমতো চক্ষুষ্মন। নিজেই পথ দেখে যেতে পারবে।

কিন্তু চোখ থাকা সত্ত্বেও হুমড়ি খেয়ে পড়ায় সহানুভূতিসচক মন্তব্য করেছিল একজন, বেচারা! বিচিত্র প্রাণীটার অনুভূতিগুলোও ভোঁতা, ত্রুটিপূর্ণ। নইলে এইভাবে হোঁচট খায়? কথাবার্তাও অসংলগ্ন, অর্থহীন প্রলাপ। হাত ধরে নিয়ে চল হে, নইলে মুখ থুবড়ে পড়বে।

বেদম হাসি পেয়েছিল নানেজের। আর বাধা দেয়নি। লাভ কী? দৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান যাদের নিতান্তই অপ্রতুল, তাদের সঙ্গে চোখ নিয়ে কথা বলাটাও আহাম্মুকি। পরে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া যাবেখন।

অন্ধ তিনজনে হাঁকার দিয়ে সজাগ করে দিয়েছিল সবাইকে। আজব চিড়িয়া এসেছে তাদের দেশে, বাচ্চাকাচ্চারা যেন তার সান্নিধ্যে আঁতকে না ওঠে। নানেজের কানে ভেসে এসেছিল বহু ব্যক্তির চেঁচামেচি, দেখেছিল, গ্রামের মধ্যিখানের পথে জড়ো হচ্ছে কাতারে কাতারে মানুষ। কাছাকাছি হতেই হেঁকে ধরেছিল নানেজকে। গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝতে চেয়েছিল আজব চিড়িয়াটা কী ধরনের। কেউ কেউ ভয়ে কাছে আসেনি। কিন্তু কান খাড়া করে শুনেছে নানেজের প্রতিটি কথা। ওর চড়া, কর্কশ কণ্ঠস্বর যে মোটেই

শ্রুতিমধুর নয়, অন্ধদের সংবেদনশীল কর্ণকুহরে অত্যাচার সৃষ্টি করে চলেছে–মুখের ভাব দেখে তা অনুমান করেছে নানেজ। শুধু কানের পরদা নয়, অন্ধ মানুষদের সবকিছুই কোমল এবং তীব্র মাত্রায় অনুভূতিসচেতন। হাত নরম, মুখের ভাবও স্নিগ্ধ সুন্দর। কয়েকজনকে দেখতে মিষ্টি ফুলের মতোই। শুধু যা চোখ নেই কারওই, চোখের গর্তে অক্ষিগোলক হারিয়ে গেছে চিরতরে। পথপ্রদর্শক অন্ধ তিনজন আগাগোড়া আগলে রেখেছিল তাকে, নানেজ যেন তাদেরই একার সম্পত্তি, পাহাড় থেকে খসে-পড়া বিচিত্র জীবটার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

নানেজ বোঝাতে চেয়েছে, তার দেশ বাগোটা নামক জায়গায়, অনেক দূরে, পাহাড়ের ওপারে।

কিন্তু বাগোটা নামটাই যে তাদের কাছে নতুন। রঙ্গপ্রিয় একটা বাচ্চা বলে উঠেছে, অদ্ভুত মানুষটার নাম নাকি বাগোটা, আধো আধো বুলি ফুটেছে মুখে, তাই ভালো করে কথাও বলতে পারছে না। ফোড়ন দিয়েছে পেড্রো। নানেজের সবকিছুই নাকি কচি খোকার মতো। নির্ভুল পদক্ষেপে হাঁটতেও শেখেনি। নইলে আসবার সময়ে দু-দুবার হোঁচট খায়?

ধৈর্য ফুরিয়ে আসছিল নানেজের। স্নায়ুর ওপর এই ধরনের ধকল যাবে, আগে ভাবেনি। নারী-পুরুষ, বাচ্চাকাচ্চা প্রত্যেকেই তাকে অদ্ভুত জীব মনে করছে, হাসছে, টিটকিরি দিচ্ছে।

তারপর তাকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল প্রবীণদের আস্তানায়। গাঢ় আঁধারে ভরা একটা ঘরে, এক হাত দূরেও চোখ চলে না। এক কোণে ম্যাড়ম্যাড় করে জ্বলছে একটা আগুন। হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল নানেজ। পড়বার সময়ে বাতাস আঁকড়ে ধরতে গিয়ে

হাত লেগেছিল একজনের মুখে, অন্ধকারে তাকে দেখা যায়নি, কিন্তু রাগে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। পেছন থেকে ভয় ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্যে পেড্রো বলেছিল, নতুন জীবটার সবকিছুই এখনও অপরিণত। হাঁটে টলে টলে, কথা বলে আধো আধো।

রেগেমেগে প্রতিবাদ করেছিল নানেজ। অন্ধকারে দেখা যায় না বলেই সে হোঁচট খেয়েছে, অত চেপে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। ছেড়ে দিলেই তো হয়। ঘর ভরতি অন্ধরা শলাপরামর্শ করে নিয়ে হাত সরিয়ে নিয়েছিল নানেজের গা থেকে।

যার সামনে মুখ থুবড়ে পড়েছিল নানেজ, বয়সে সে বৃদ্ধ। অচিরেই শোনা গিয়েছিল তার কণ্ঠস্বর। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গিয়েছিল নানেজকে। নানেজ ধীরস্থিরভাবে বলেছিল তার কাহিনি। বহির্জগতের বিস্ময়, বিশাল দুনিয়া, অনন্ত আকাশ, সুউচ্চ পর্বত, দিগন্তব্যাপী সমুদ্র, সে যা দেখেছে দুচোখ ভরে, সব জ্ঞানই উজাড় করে দিয়েছিল বৃদ্ধের সামনে। আরও অনেক বয়োবৃদ্ধ বসে ছিল অন্ধকারময় সেই প্রকোষ্ঠে। দিনের আলো ক্ষীণভাবে দেখা যাচ্ছিল প্রবেশপথে। জানলা নেই দেওয়ালে। আসবার সময়ে অদ্ভুত এই ব্যাপারটাও লক্ষ করেছিল নানেজ। সারি সারি নির্মিত কুটিরের কোনওটাতেই বাতায়নের বালাই নেই।

বিস্ময়ভরা এই বিরাট পৃথিবীর কোনও বিস্ময়ই কিন্তু অন্তর স্পর্শ করেনি বৃদ্ধ অন্ধদের। চোদ্দো প্রজন্ম ধরে তারা যা জেনেছে, শিখেছে, বুঝেছে, নানেজের কথামালার সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। তাই বিশ্বাস করেনি একবর্ণও। চোখ আর দৃষ্টি তাদের কাছে একেবারেই অজ্ঞাত। কান আর আঙুলের ডগা অতিশয় অনুভূতিসচেতন। নানেজের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। তাই শিশু ঠাউরেছিল নানেজকে। অপরিণত মস্তিষ্ক আর অপ্রতুল

জ্ঞান নিয়ে যখন এসেই পড়েছে জ্ঞানবৃদ্ধ অন্ধদের সামনে, তখন জ্ঞানদান করে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার ভরিয়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। এই দেশ আগে ছিল একটা পার্বত্য খোঁদলের মধ্যে। এই তাদের পৃথিবী। এর বাইরে আর কিছু নেই। প্রথম যারা এসেছিল এই নিরালা অঞ্চলে, স্পর্শ অনুভূতি ছিল না তাদের। তারপর জাগ্রত হল আশ্চর্য সেই অনুভূতি। জীবন আর ধর্ম সম্বন্ধে শিখল অনেক কিছুই। এখন এখানকার আকাশে গান গেয়ে বেড়ায় পরিরা, মাঠে চরে বেড়ায় লাম্যারা। লাম্যারা তাদের বশ মেনেছে, পরিদের কিন্তু স্পর্শও করা যায় না, শুধু কান পেতে শোনা যায়, তারা আছে, তারা আছে। শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল নানেজ। পরি? পরক্ষণেই বুঝেছিল, পাখিদের কথা বলা হচ্ছে। পাখিরাই এদের কাছে পরি!

প্রবীণতম অন্ধ দিনরাতের অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল নানেজকে। অন্ধদের কাছে দিন মানে উষ্ণ সময়, রাত্রি মানে শীতল সময়। দুভাগে ভাগ করা দুটিমাত্র সময় ছাড়া দিনরাতের মাধুর্য তাদের অজানা। উষ্ণ সময়ে তারা ঘুমায়। শীতল সময়ে কাজ করে। এখন ঘুমানোর সময়, নানেজ কি ঘুমাবে? ঘুমাতে হয় কী করে, জানে তো? কথাবার্তা যার অসংলগ্ন, চলতে গেলে হোঁচট খায়, ঘুমাতে হয় কী করে, তা কি শিখিয়ে দিতে হবে?

নানেজ যেন কচি খোকা, দোলনার শিশু। অসীম সহানুভূতি ঝরে পড়েছিল বৃদ্ধদের কণ্ঠে।

নানেজ বলেছিল, ঘুমাতে সে জানে। ঘুমাবেও। তার আগে চাই খাবার। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

খাবার এনে দিয়েছিল অন্ধরা। নিরালায় বসে পেট ভরে খেয়েছিল নানেজ। কখনও হেসেছে, মজা পেয়েছে, আবার রাগও হয়েছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু ভেবেছে তাকে। শিশুর মতোই নাকি মনবুদ্ধি, কথাবার্তা, চলাফেরা পেকে ওঠেনি। নির্বোধ কোথাকার! রাজা হতে যে এসেছে অন্ধদের দেশে, তার সম্বন্ধে কী চমৎকার ধারণা! সময় আসুক, বুদ্ধি আর জ্ঞান কাকে বলে, হাতেনাতে দেখিয়ে দেবে। হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে ছাড়বে।

অন্ধদের দেশে সবাই যখন ঘুমাচ্ছে, নানেজ তখন জেগে বসে। সাত-পাঁচ ভাবছে আর নানান ফন্দি আঁটছে। ভাবতে ভাবতেই বিকেল গড়িয়ে সূর্য অস্ত গেল।

সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দেখে মনটা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল নানেজের, তুষার প্রান্তর আর হিমবাহের ওপর গোধূলির বর্ণসুষমা দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। বিপুল আবেগে প্রণত হয়েছিল ঈশ্বরের উদ্দেশে, যার আশীর্বাদে এই চক্ষুরত্ন ব্যবহার করে মহান সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছে সমস্ত হৃদয় দিয়ে।

গ্রাম থেকে একজন অন্ধ হাঁক দিয়ে ডেকেছিল তাকে।

একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারেনি নানেজ। তার যে চোখ আছে এবং আশ্চর্য এই প্রত্যঙ্গটার ক্ষমতা কতখানি, তা সমঝে দেওয়ার এই তো সুযোগ। হেসে উঠে বলেছিল, এই তো আমি।

কাছে এসো।

ইচ্ছে করেই রাস্তা ছেড়ে ঘাসের ওপর পা দিয়েছিল নানেজ–যাতে শব্দ না করে এগিয়ে গিয়ে চমকে দেওয়া যায় মূঢ় অন্ধটাকে।

ধমক খেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। ঘাসে পা দেওয়া হচ্ছে কেন? রাস্তা থাকতে ঘাসের ওপর যায় তো খোকাখুকুরা? বুদ্ধিশুদ্ধি, জ্ঞানগম্যি কি একেবারেই নেই?

অট্টহেসে জবাব দিয়েছিল নানেজ, চোখ তো আছে, তোমাদের মতো অন্ধ নই।

অবাক হয়ে গিয়েছিল দৃষ্টিহীন গ্রামবাসী। চোখ আর অন্ধ, এ দুটো শব্দ তার জানা নেই। বাঁচালতা আর প্রলাপ বকা যেন বন্ধ করে আগন্তুক। এখনও অনেক জানবার আছে এই দুনিয়ায়। আস্তে আস্তে সব শিখিয়ে নেওয়া যাবে।

সে কী হাসি নানেজের, তাহলে একটা গান শোনাই শোন... একচক্ষুও জেনো রাজা অন্ধদের সেই দেশে।

আবার ধমক খেতে হয়েছিল গান শোনাতে গিয়ে। অন্ধ আবার কী? অন্ধ বলে কোনও শব্দ আছে নাকি?

এইভাবেই গেল চারটে দিন, চারটে রাত। অন্ধদের দেশে রাজা হওয়ার বাসনা তিরোহিত হল একটু একটু করে। পয়লা নম্বরের অপদার্থ এই বিচিত্র জীবটাকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে গেল অন্ধরা। দৃষ্টিশক্তি তাদের নেই ঠিকই, কিন্তু আছে আশ্চর্য প্রখর শ্রবণশক্তি আর ঘ্রাণশক্তি। দূর থেকেই হৃৎস্পন্দন শুনে আর গায়ের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, কে আসছে এগিয়ে, আর কে যাচ্ছে দূরে। লাম্যারা নির্ভয়ে নেমে আসে পর্বত থেকে জুগিয়ে যায়

খাদ্য, পরিধেয় এবং দুগ্ধ। চাষবাস করে নিখুঁতভাবে। জমি কর্ষণ করে সুচারুভাবে। পথঘাট মসৃণ–উঁচুনিচু নেই কোথাও। মেহনত করে রাতে ঘুমায় দিনে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তো পেয়ে যাচ্ছে অল্পায়াসেই। বাড়তি সময়টুকু কাটায় গানবাজনা নিয়ে। অবসর বিনোদনের আয়োজনে ত্রুটি নেই কোথাও। সরল গ্রাম্য জীবন। জটিলতাবিহীন ধর্মভীরু মানুষ। নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারী। ছেলেপুলে-বউ নিয়ে সুখের সংসার।

চক্ষুরত্নের ব্যবহার তাই তাদের বোঝাতে পারেনি নানেজ। তিতিবিরক্ত হয়ে বিদ্রোহী হল একদিন।

জোর করে জ্ঞান দিতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। অন্ধদের ধারণা ছিল, লাম্যারা যেখানে বিচরণ করে–পৃথিবীর শেষ সেইখানেই। মাথার ওপর আছে পাথুরে ছাদ। সূর্য, চন্দ্র, তারা, মহাকাশ, মেঘ–কিসসু নেই।

নানেজের মুখে উলটো কথা শুনে তারা ভাবলে, নানেজ তাদের মন্দ শেখাচ্ছে। অধার্মিকের মতো এ জাতীয় কথাবার্তা তারা শুনতে চায় না। প্রথম প্রথম কান পেতে শুনত নানেজের কথা। শুনত এই পৃথিবীর সীমাহীন বিশালতা আর অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা। কিন্তু চোখ যাদের নেই, তাদের কাছে এসব কথা দুষ্ট কথা ছাড়া কিছুই নয়। তাই আরম্ভ হল বকাঝকা। তা সত্ত্বেও দমেনি নানেজ। চোখ না-থাকার কত অসুবিধে, বুঝিয়ে দেবার জন্যে একদিন বলেছিল, পেড্রো আসছে সতেরো নম্বর রাস্তা দিয়ে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। পেড্রো কিন্তু সতেরো নম্বর রাস্তা ছেড়ে আড়াআড়িভাবে চলে গেল অন্য রাস্তায়, কাছে এল না। শুরু হল টিটকিরি। পরে যখন

শুনল পেড্রো, রেগে আগুন হল নানেজের ওপর। কুশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে গাঁয়ের মানুষদের, নানেজ তাই শত্রু হয়ে উঠল তাদের কাছে।

তবুও হাল ছাড়েনি নানেজ। রাজা হওয়ার বাসনা উগ্রতর হয়ে উঠেছিল রক্তের মধ্যে। মাঠের মধ্যে গিয়ে অন্ধদের চক্ষুরত্নের ক্ষমতা বোঝাতে চেয়েছিল। হাসি-মশকরা শুনে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। বুঝিয়ে যখন কিছু হল না, বলপ্রয়োগে রাজা হবে ঠিক করেছিল। একটা কোদাল কুড়িয়ে তেড়ে মারতে গিয়েও থমকে গিয়েছিল।

অন্ধকে তো এভাবে মারা যায় না!

নিশ্চুপ দেহে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অন্ধরা। টের পেয়েছিল, কোদাল কুড়িয়ে নিয়েছে নানেজ! হুকুমের স্বরে বলেছিল কোদাল ফেলে দিতে। শোনেনি নানেজ। গাঁ থেকে দল বেঁধে বেরিয়ে এসেছিল অন্ধরা কোদাল আর শাবল নিয়ে। অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে ফেলেছিল তাকে বাতাসের গন্ধ শুঁকে। মাড়িয়ে-চলা ঘাসের ওপর পা ফেলে ফেলে নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিল ধীরগতিতে। রাগতস্বরে ফের বলেছিল কোদাল ফেলে দিতে। নানেজ শোনেনি। ভয় পেয়েছিল সেই প্রথম। চোখ নেই, অথচ পায়ে দলা ঘাস আর বাতাসে গায়ের গন্ধ শুঁকে অন্ধরা তাকে ঘিরে ফেলেছে কোদাল-শাবল হাতে। রাজা হওয়া তো দূরের কথা, এখন পালাতে পারলে বাঁচে। একজনকে মরিয়া হয়ে শাবল দিয়ে এক ঘা কষিয়ে পাগলের মতো দৌড়ে গিয়েছিল পাঁচিলের কাছে। কিন্তু মসৃণ আস্তরণ বেয়ে ওঠা সম্ভব নয়। অদূরে ছিল একটা ছোট্ট দরজা। দরজা পেরিয়ে সাঁকো, তারপর পাহাড়। লাম্যাদের বিচরণ স্থল। সেইখানেই পালিয়েছে নানেজ। দুদিন দুরাত খাবার জোটাতে পারেনি। রাজা হওয়ার সাধ ফুরিয়েছে এইভাবেই।

অবশেষে পুঁকতে ধুঁকতে নেমে এসেছে অন্ধদের মধ্যে। হ্যাঁ, সে অন্যায় করেছে। চোখ বলে কোনও প্রত্যঙ্গ নেই। দৃষ্টিশক্তি অবান্তর কথা। মাথার ওপর পাথুরে ছাদ ছাড়া আর কিসসু নেই, আকাশ, নক্ষত্র, মেঘ, সব বাজে কথা। ভুল করেছে সে। ক্ষমা চায়। বড় খিদে পেয়েছে। খাবার চায়।

ক্ষমা পেয়েছিল সহিষ্ণু অন্ধদের কাছে। বেত্রাঘাত আর অন্ধকার ঘরে বন্দি–এই শাস্তিভোগের পর আর পাঁচজনের মতোই সরাসরি কুলির মতো খাটতে হয়েছে মাঠেঘাটে। তার মতো নির্বোধ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এর চাইতে বড় কাজ দিতে চায়নি অন্ধরা। অসুস্থ হয়েছিল, সেবা পেয়েছে। প্রবীণরা এসে জ্ঞান দিয়েছে–মনের বিভ্রান্তি ঘোচাতে চেয়েছে।

আস্তে আস্তে অন্ধদের মধ্যে ভিড়ে গেছে নানেজ। ইয়াকুবের গোলাম হয়ে সারারাত খেটেছে খেতে। ইয়াকুব লোকটা ভালো, না রেগে গেলে। তার ছোট মেয়ে মেদিনা-সারোতে কিন্তু দিদিদের মতো দেখতে নয়। সুঠাম মুখশ্রী। চোখ অক্ষিকোটরে ঢোকানো নয়। চোখের পাতাও নড়ে। যেন ইচ্ছে করলেই দৃষ্টিশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। কণ্ঠস্বর মোলায়েম নয়। অন্ধদের কাছে এইসব কারণেই সে সুন্দরী নয়। যার চোখ ঠেলে থাকে, চামড়া রুক্ষ, স্বর কানে বাজে–তার কি বর জোটে?

নানেজের কিন্তু পছন্দ হয়েছিল তাকে এইসব কারণেই। আড়ালে পেলেই তাকে শোনাত বহির্জগতের কথা, এই সুন্দর বিশ্বের বর্ণসুষমার কথা। কান পেতে একমনে শুনত সে। তারপর একদিন বিয়ের কথা উঠতেই বেঁকে বসল তার দিদিরা। এমনকী গাঁয়ের যুবকরাও। মেদিনা-সারোতে অসুন্দরী–তা-ই বলে কি একটা জরদ্গবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে

বিকৃত প্রজন্মের সূচনা করতে হবে? রক্ত অশুচি করতে হবে? কক্ষনো না। একজন তো মেরেই বসল নানেজকে। নানেজ পালটা মার দিয়ে শুইয়ে দিলে তাকে।

এবং সেই প্রথম হাতেনাতে দেখিয়ে দিলে, হাতাহাতি মারপিটে চোখ কত কাজে লাগে।

তারপর থেকে কেউ আর তার গায়ে হাত দেয়নি। মেদিনা-সারোতে কিন্তু কেঁদে পড়েছিল বাবার কাছে। মেয়ের কান্নায় গলে গিয়ে গাঁয়ের প্রবীণদের পরামর্শ নিতে গিয়েছিল ইয়াকুব। ভেবেচিন্তে একজন বয়োবৃদ্ধ শুনিয়েছিল আশার বাণী। নানেজকে তাদের মতো করে নেওয়া যাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে। ওর মাথার গোলমাল ঘটছে চোখ নামক ঠেলে বেরিয়ে থাকা ওই অদ্ভুত রোগগ্রস্ত প্রত্যঙ্গটা থেকে। মগজে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে ওই জিনিসটা। যত উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি ওইখান থেকেই। অস্ত্রোপচার করে জিনিসটাকে বাদ দিলেই নানেজ সুস্থ হয়ে উঠবে, ইয়াকুবের জামাই হতে পারবে।

কিন্তু বেঁকে বসেছিল নানেজ। বাকি জীবনটা এই অন্ধদের দেশেই তাকে থাকতে হবে ঠিকই, রাজার মতো নয়, ক্রীতদাসের মতো। কিন্তু চক্ষুর বিসর্জন দিয়ে কারও জামাই হতে সে রাজি নয়।

নিঃশব্দে কেঁদেছিল মেদিনা-সারোতে। নানেজের কল্পকাহিনি শুনতে তার ভালো লাগে। ভালো লাগে তার সঙ্গ। তাহলে কেন রাজি হচ্ছে না? সামান্য একটু ব্যথা পাবে বই তো নয়, তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অশ্রুসিক্ত মিষ্টি মুখখানার পানে অনিমেষে চেয়ে থেকে অবশেষে রাজি হয়েছিল নানেজ!

অস্ত্রোপচারের এক সপ্তাহ আগে মহা উদ্যমে অন্ধরা তাকে শিক্ষাদান করে গেল, পরিমার্জনা এবং পরিশোধনের বিস্তর আয়োজন করল, গোলামি আর নিকৃষ্ট সত্তাটাকে উন্নততর করে অন্ধদের পর্যায়ে তাকে নিয়ে আসার জন্যে কোনও প্রয়াসই বাকি রাখল না। নানেজের চোখ থেকে ঘুম উড়ে গিয়েছিল। দিবাভাগের অরুণ-কিরণদীপ্ত অন্ধ-নিকেতনে যখন দৃষ্টিহীনরা সুষুপ্ত, নানেজ তখন নিবিষ্ট চিন্তায় নিমগ্ন থেকে বিমর্ষচিত্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করেছে লক্ষ্যহীনভাবে। উভয়সংকটের দুশ্চিন্তা বহু বিষধর সরীসৃপের মতো তার শিরায়-ধমনিতে বিচরণ করেছে, তাকে অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে। দুর্ধর্ষ দুঃসাহসিকতায় দুর্দান্ত সে চিরকালই, কিন্তু অন্ধ-আলয়ে আজ সে নিতান্তই অসহায়। পর্বতারোহীর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলেই মৃত্যুকে পরোয়া করেনি কোনওদিনই, অকুতোভয় মানুষটার ধারেকাছেও তাই মৃত্যু তার করাল ছায়া ফেলতে সাহসী হয়নি। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতিতে পড়েছে, তার চাইতে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনও অনেক বরণীয়। অথচ সম্মতি দিয়েছে চক্ষুরত্ন উৎপাটনের। কাজের প্রহর শেষ হলেই বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে বর্ণময় শিখরে শিখরে জীবনের সুবর্ণশোভা মেলে ধরে তপনদেবের আবির্ভাব ঘটতেই আরও মুষড়ে পড়ল নানেজ। আজই শেষ দিন। ঈশ্বরের দেওয়া ঐন্দ্রজালিকের ক্ষমতাসম্পন্ন এই চক্ষু প্রত্যঙ্গটিকে বিসর্জন দিতে হবে আজকে, নিশুতি রাতে। মেদিনা-সারোতের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ঘুমাতে যাওয়ার আগে কোমল কণ্ঠে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে গেছে নানেজকে। ক্ষণিকের যন্ত্রণাবোধের পরেই নানেজ পাবে চিরশান্তি, মগজের অহরহ যন্ত্রণা মিলিয়ে যাবে চিরতরে, অচিন্ত্যপূর্ব প্রশান্তিতে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে নানেজ।

নিমেষহীন নয়নে নয়ন-প্রসাদে বঞ্চিত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে তাকে বিদায় জানিয়েছে নানেজ। অসীম করুণায় আর্দ্র হয়েছে চিত্ত।

বিদায় জানিয়েছে দুই করতল মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে। বলেছে স্নেহক্ষরিত স্বরে, বিদায়।

নিঃশব্দে সরে গিয়েছে দূর হতে দূরে। পায়ের শব্দ কান পেতে শুনেছে মেদিনা সারোতে। ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে আসছে কিন্তু দৃঢ় পদধ্বনি। পদধ্বনির মধ্যে জাগ্রত হয়েছে এমন একটা ছন্দ, যা যাত্রার আগে ধরা পড়েনি মেদিনা-সারোতের আতীক্ষ্ণ শ্রবণযন্ত্রে। তাই অকস্মাৎ প্রবল আবেগে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে।

নানেজ চেয়েছিল, জনশব্দহীন নিরালা কোনও তৃণভূমিতে গিয়ে নিবিষ্ট থাকবে অন্তরের অন্তঃস্থলের দুঃসহ চিন্তায়। যে আবেগ প্রবল বন্যার মতো উৎসারিত হচ্ছে মনের গহনতম অঞ্চল থেকে, তাকে আর বাঁধ দিয়ে ধরে রাখতে পারছে না। ঘাস, সবুজ প্রান্তরের নার্সিসাস পুষ্পের পাশে একলা বসে থাকবে চক্ষু বিসর্জনের সময় আগত না-হওয়া পর্যন্ত। যেতে যেতে বিহ্বলভাবে দুচোখ তুলে তাকিয়েছিল অজস্র বর্ণে প্রদীপ্ত ভোরের আকাশের দিকে। দেখেছিল, উষাদেবী যেন সোনার বর্ম পরে নেমে আসছে কাঞ্চন-সোপান বেয়ে।

ওই তো স্বর্গ! ওই তো দেবতাদের আলয়! মহান ওই সৌন্দর্য দেখে অকস্মাৎ তার মনে হয়েছিল, অপরূপ এই দৃশ্যের তুলনায় অন্ধদের এই নিকেতন একটা বদ্ধ বিবর ছাড়া কিছুই নয়–পাপাত্মা-পরিবেষ্টিত হয়ে এই পাপপুরীতে, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রসাদবঞ্চিত এই অন্ধ মানুষদের দেশে অন্ধত্ব অর্জন করে তাকেও কি সরে আসতে হবে স্বর্গের কাছ থেকে? এমনকী স্বর্গদৃশ্যও মুছে দিতে হবে চিরতরে চোখের সামনে থেকে?

পুষ্পসমৃদ্ধ কানন থেকে ফিরে যাবে–এইটাই মনস্থ করেছিল কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু সহসা আকাশ আর উচ্চ পর্বতালয়ের অজস্র বর্ণদীপ্ত সুষমা অবসান ঘটাল উভয়সংকটে অস্থির চিত্তবিক্ষেপের। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সম্মুখে। প্রাচীরের ওপারে সাঁকো পেরিয়ে আরোহণ করতে লাগল পাহাড় বেয়ে, সম্মোহিতের মতো কিন্তু আগাগোড়া চেয়ে রইল চিত্ত-অবশকারী অনিন্দ্যসুন্দর তপন-প্রদীপ্ত তুষার আর বরফের পানে।

অনন্ত সৌন্দর্য দেখে তিরোহিত হল তার অন্তরের বিষাদের যবনিকা। অশুচি জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার নীরব আহ্বান সে উপলব্ধি করেছে, হৃদয়ের প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়েছে পরম কারুণিকের অমোঘ আহ্বান–শক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে পেশিতন্ত্রীতে। জাগরূক হচ্ছে কল্পনা–উন্মোচিত হচ্ছে স্মৃতির আধার। মনে পড়ছে ফেলে-আসা বাগোটাকে। যেখানে দিনের আলো সগর্বে কর্মচঞ্চল রাখে চক্ষুষ্মনদের, নিশীথের রোমাঞ্চ নিদ্রিত করে কর্মক্লান্ত মানুষকে। বিস্তর প্রাসাদ, অট্টালিকা, নিকেতন আছে যেখানে, আছে পথ, যানবাহন। আরও দূরে আছে দিগন্তব্যাপী সুনীল জলধি। নদীপথে দিনের দিন বহু অ্যাডভেঞ্চারের পর পৌঁছানো যায় সীমাহীন সেই জলরাশির উত্তাল তরঙ্গশীর্ষে শুরু হয় বৃহত্তর দুঃসাহসিকতা–জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে, মত্ত প্রভঞ্জনের সঙ্গে লড়াই করে টহল দিয়ে আসা যায় বিশাল ভূগোলকটিকে।

আশ্চর্য উদার বিশাল সেই দুনিয়ার সামনে যবনিকা তো ওই পর্বত প্রাচীর। অতীব খাড়াই দুর্গম এবং দুরারোহ।

চোখ কুঁচকে আসে নানেজের। নির্নিমেষে চেয়ে থাকে প্রদীপ্ত পর্বতশিখরগুলোর দিকে।

চেষ্টার অসাধ্য কিছু আছে কি? দুপাহাড়ের ফাঁকে ওই খাঁজের খোঁচা খোঁচা পাথরে পা দিয়ে সন্তর্পণে উঠে যাওয়া কষ্টকর হতে পারে, অসম্ভব নয়। অচিরেই পৌঁছে যাবে পাইন। অরণ্যে। চাতালের মতো পাথরে ওই যে কিনারাটা দেখা যাচ্ছে, ওখান দিয়ে উঠে যাবে আরও উঁচুতে গিরিবর্জ্যের মাথার দিকে। তারপর নিশ্চয় ভাগ্য সহায় হবে। প্রকৃতি তাকে ডাক দিয়েছে–প্রকৃতিই তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তুষাররেখার নিচেই ওই চিমনি দিয়ে উঠবে আরও ঊর্ধ্বে–একটা চিমনিপথ দুরারোহ হলে আরও একটা খুঁজে নেবে। তার চোখ আছে, চোখ মেলে সে পথের বাধা দূর করতে পারবে না? একসময়ে নিশ্চয় পৌঁছে যাবে অম্বর-আলোকিত তুষারলোকে–ধু ধু শূন্যতার মধ্যে পাবে মুক্তির স্বাদ, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নতুন পথ...

ফিরে তাকালে গ্রামের দিকে। চেয়ে রইল চোখের পাতা না ফেলে।

মনে পড়ল মেদিনা-সারোতের কথা। বহু দূরে অস্পষ্ট বিন্দুর মতো দেখা যাচ্ছে তার নিষ্কম্প মূর্তি।

চোখ ফেরালে পর্বত প্রাচীরের দিকে দিনের আলোর ঢল নামছে প্রাচীর বেয়ে।

তনু-মন সংহত করে শুরু হল পর্বতারোহণ।

সূর্যাস্ত। নানেজ আর পাহাড় বেয়ে উঠছে না। নিশূপ দেহে শুয়ে আছে। অধরপ্রান্তে অসীম প্রশান্তির নিবিড় হাস্যরেখা। পোশাক যদিও শতচ্ছিন্ন, হাত-পা রক্তারক্তি, সারা গায়ে কালশিটের নীল বর্ণ, তা সত্ত্বেও আত্মপ্রসাদের অনাবিল প্রশান্ত হাসিতে সমুজ্জ্বল মুখ।

এত উঁচু থেকে অন্ধদের গ্রামটাকে মনে হচ্ছে যেন একটা গভীর বিবর। মাইলখানেক নিচে একটা বদ্ধ উপত্যকা। গোধূলির অস্পষ্টতা গ্রাস করছে অভিশপ্ত উপত্যকাকে একটু একটু করে। মাথার ওপরে শিখরগুলোয় অগ্নিদেবের রোশনাই যেন খুশির পেখম মেলে ধরেছে। হাতের কাছেই ঝলমল করছে আরও অপরূপ সৌন্দর্য। সবুজ খনিজ মিশেছে ধূসর খনিজে। ক্রিস্টালের চমক-দ্যুতি চোখ ঝলসে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। বিশাল খাদগুলোর মধ্যে অসীম রহস্যময়তার মধ্যে নীলাভ আর বেগুনি আভা। তমিস্রার ক্রীড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপর পরমানন্দে হাসছে আলোকময় আকাশ।

এই তো স্বর্গ। অন্ধদের দেশে রাজা হওয়ার বাসনা আর তার নেই।

রাত ঘনীভূত হল। নিবিড় তমিস্রায় গা এলিয়ে শুয়ে শীতল নক্ষত্ররাজির পানে নির্নিমেষে চেয়ে রইল নানেজ...